দৈনিক ইনকিলাব

149

তারিখ 18 MAY 1987
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

৩রা মে ১৯৮৭

শিক্ষাঙ্গন

বেসরকারী বিদ্যালয়ের প্রশাসন ব্যবস্থা

বেসরকরী বিদ্যালয়গুলোর সমস্যা আজ ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। আর এর মূলে রয়েছে সাবেক কালের পাঠশালাসমূহের প্রশাসন পদ্ধতি। ফলে বিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কাঠামো যেমন ভেঙ্গে পড়েছে, তেমনি শিক্ষক অসন্তোষ, দলাদলি, কোন্দল, শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট করে দিচ্ছে। বর্তমানে শিক্ষার ক্ষেত্রে বেশ কিছু পরিবর্তন করা হলেও বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে তা মোটেই কার্যকরী হয়নি। বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের সমস্যা এখন প্রতিটি নগর, জেলা, উপজেলা পর্যায়ে প্রকট হয়ে উঠেছে। এর প্রধান কারণ হলো একজনের হাতে অর্থাৎ প্রধান শিক্ষকের হাতে সকল প্রশাসনিক ক্ষমতা কুক্ষিগত রাখা। যোগদানের পর থেকে আমৃত্যু একই ব্যক্তি সেই প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক থাকেন। তার কোন পরিবর্তন সচরাচর হয় না। তিনি একাধারে প্রধান শিক্ষক এবং সেক্রেটারীর কাজ করে থাকেন। ফলে ঐ বিদ্যালয়ে আয়-ব্যয় হিসাব থেকে উন্নয়ন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগের ব্যাপারে 'স্বজনপ্রীতি' থেকে সকল ব্যবস্থা করে থাকেন। এতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দলের সৃষ্টি হয়।

আধুনিক ব্যবস্থায় এর পরিবর্তনের দরকার কারণ প্রয়োজনের তাগিদেই বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বিভাগগুলোতে বিভাগীয় প্রধান চেয়ারম্যানশীপের পরিবর্তন করা হয়েছে। তিন বছরের জন্য ঐ সভাপতির দায়িত্ব অর্পিত হয়ে থাকে।

এতে বিভাগীয় কোন্দল যেমন কমেছে, তেমনি যথেচ্ছার এবং শিক্ষার পরিবেশও সুস্থ হয়ে উঠেছে। মাধ্যমিক বেসরকারী বিদ্যালয়সমূহের ক্ষেত্রেও এই ব্যবস্থা হওয়া বাঞ্ছনীয়। কারণ সাধারণতঃ দেখা যায় প্রধান শিক্ষক বা শিক্ষিকা বিদ্যালয়ের সেক্রেটারী এবং ঐ এলাকার একজন শক্তিধর ব্যক্তি বিদ্যালয়ের সভাপতি। এই কমিটিতে অন্যান্য সদস্য যারা থাকেন তারাও ঐ দুই ব্যক্তির আস্থাভাজনেই সাধারণতঃ হয়ে থাকেন। এর ফলে বিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ব্যবস্থা একতরফাভাবে কোণঠাসা হয়ে পড়ে। এই ব্যবস্থায় প্রধান শিক্ষকের ভূমিকাই থাকে মুখ্য। তার মর্জি মতে বিদ্যালয়ের সব কাজ পরিচালিত হয়। ফলে উন্নয়নসহ বিদ্যালয়ের পরিচালনা সমস্যার আবর্তে ঘুরপাক খেতে থাকে। যদি কোন শিক্ষক প্রধান শিক্ষকের এই অব্যবস্থা বা সমস্যা সমাধানের জন্য কোন বক্তব্য রাখেন বা কোন কার্যকর পরামর্শ দেন তবে এ ক্ষেত্রে তার চাকরিটি হারানোর আশংকাই থাকে সবচেয়ে বেশী।

ফলে সমস্যার আর সমাধান হয় না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অন্যান্য প্রতিষ্ঠান হতে সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র। প্রশাসনিক ব্যবস্থা তাই হতে হবে সম্পূর্ণ ভিন্নতর।

এছাড়া চলতি পদ্ধতি অনুসারে প্রধান শিক্ষকের সাথে শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তাদের যোগাযোগ সীমাবদ্ধ থাকায় তারা শুধু তাদের ভালটুকু আদায় করে থাকেন। ফলে সহকারী শিক্ষকদের সমস্যা তুলে ধরার কোন উপায় থাকে না। এতে সহকারী শিক্ষকেরা তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হন। এই যোগাযোগ শূন্যতার ফলেই বেশীরভাগ সহকারী শিক্ষক তাদের ইনক্রিমেন্ট, শিক্ষক অনুদান, বিদ্যালয় হতে দেয় বাড়ী ভাড়া ইত্যাদি থেকে বঞ্চিত হন।

এ বিষয়ে শিক্ষা বিভাগ ও নবগঠিত শিক্ষা কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই— শিক্ষা কমিশন বুদ্ধিজীবী, প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ নিয়ে গঠিত। তাঁরা যেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মূল প্রশাসনসমূহের অব্যবস্থাগুলো সমাধানকল্পে সুষ্ঠু ও কার্যকরী প্রস্তাব সরকারের কাছে পেশ করেন।

প্রশাসনিকভাবে সহকারী শিক্ষককে কোণঠাসা করে রাখলে, সেখানে প্রকৃত শিক্ষার পরিবেশ গড়ে উঠবে না। ব্যক্তিসত্ত্বার উপর আঘাত আসলেই মনের উপর আঘাত আসে। মনের উপর আঘাত আসলেই শিক্ষার্থীদেরকে সুষ্ঠুভাবে শিক্ষা দেয়া সম্ভব নয়। যিনি শিক্ষকতা করেন তাকে সব দিক থেকে বিদ্যাশিক্ষা দেয়ার ব্যাপারে সহযোগিতা করতে হবে। তা না হলে শিক্ষার্থীদেরকে শিক্ষা দেয়ার সুষ্ঠু শিক্ষার পরিবেশ গড়ে উঠবে না। এ ক্ষেত্রে আমার পরামর্শ হলো— মূল কমিটিকে ঠিক রেখে প্রধান শিক্ষক, যিনি সম্পাদক বা সেক্রেটারীর দায়িত্ব পালন করবেন, তাকে প্রতি তিন বছর অন্তর সরিয়ে পরবর্তী সিনিয়র শিক্ষককে সেই দায়িত্বে নিযুক্ত করা হোক। যেভাবে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বিভাগগুলোতে চলছে।

—মোঃ শামসুল আলম